বাসা

(গল্পগ্রন্থ – জ্যোতিরিঙ্গণ)

খড়গপুরে সভা করতে গিয়েছিলাম। বৈশাখ মাস, বৃষ্টি হয়নি। প্রায় সারামাস, তার ওপর খড়গপুর শহরের গরম। গাছ নেই পালা নেই—ছোট্ট ছোট্ট রেলওয়ে কলোনির বাসাঘর, সামনে দিয়ে ট্রেন চলে গেছে, ময়লা জলে ভর্তি। চার নম্বর বাসায় তবুও যা হয় লোক একরকম বাস করতে পারে, তিন নম্বর বাসায় কষ্টেসৃষ্টে চলে, কিন্তু দুনম্বর এবং এক নম্বরের বাসা যে হতভাগ্য লোকেদের জন্যে তৈরি হয়েছে, তারা পশুজীবন যদি যাপন করত অরণ্যে, এর চেয়ে অনেক ভালো থাকতে পারত, ভগবানের আলো-বাতাস থেকে এভাবে বঞ্চিত হত না।

এক ভদ্রলোকের বাড়ি অতিথি হয়েছিলাম। তিনি কি একটা ভালো কাজ করেন, চার নম্বর বাসায় বাসের অধিকার পেয়েছেন। সেই নীচু নীচু ছোট ছোট ঘরে তাঁর স্ত্রী কার্পেটের ওপর ফুল-বসানো অক্ষরে 'পতি পরম গুরু' লিখে বাঁধিয়ে রেখেছেন। ডিশ, পেয়ালা, পুতুল, মাটির ময়ূর সাজিয়ে রেখেছেন কাচের আলমারিতে, দেওয়ালে টাঙানো আছে সানলাইট সাবানের ক্যালেন্ডার এবং মহাত্মা গান্ধীর ছবি, রাসলীলা ও চৈতন্যদেবের সংকীর্তনের ছবি। কোথাকার মজুরেরা এক বিদায়-অভিনন্দন দিয়েছিল বাড়ির কর্তাকে, সেখানা বাঁধিয়ে টাঙানো—ইত্যাদি। হাওয়া আসে সামান্য, বৈশাখের উত্তাপে নীচু কংক্রিটের ছাদ আগুনের খাপরার মতো গরম হয়েছে, হাত-পা নাড়ার স্থান নেই বাসার মধ্যে, গরমে হাঁপ ধরে যায়। চোখের দৃষ্টি সর্বদা দেওয়ালে বেধে যাচ্ছে।

আমি বললাম—কি করে থাকেন এখানে?

গৃহস্বামী বললেন—কি করি বলুন! চাকরি—

—কত বছর আছেন?

—১৯২৭ সালে জয়েন করেছি। তাহলে হিসেব করুন—এই একুশ বছর চলছে।

—বরাবর এই বাসায়?

—তাহলে তো বাঁচতাম। মাইনে যখন কম ছিল, তিন নম্বর বাসায় ছিলাম ন বছর। দু নম্বর বাসা আপনি যদি দেখতেন, তবে না-জানি কি বলতেন! সেই দু নম্বর বাসায় এক বছর।

আমি মনে মনে কল্পনা করলুম সামান্য দু-একশ টাকার জন্যে এই ভদ্রলোক কত জ্যোৎস্নাময়ী দুপুররাত্রির রহস্য, কত বর্ষার ঝর-ঝর ছন্দ, কত সজনে-ফুল-ফোটা কোকিল-ডাকা ফাল্গুনদিন, কত মধুর অপরাহ্ন হারিয়েছেন। শুধু ইনি যে একা হারিয়েছেন তা নয়, এঁর বাড়ির ছেলেমেয়েরা হারিয়েছে তাদের জীবনের অতি রহস্যময় বাল্যদিনগুলির পরম পবিত্র মুহূর্ত, হারিয়েছেন এঁর স্ত্রীও। তার চেয়েও কষ্ট এই যে, এঁরা জানেন না যে এঁরা কি হারিয়েছেন—সেই কি যেন একটা জিনিসের বিজ্ঞাপনে যেমন ছবির নীচে লেখা থাকে। বললাম—ছুটি পেয়ে দেশে যান ক'বার?

—ক'বার? মাত্র দু'বার দেশে গিয়েছি এই ক'বছরের মধ্যে।

আপনা-আপনি আমার অজ্ঞাতসারে আমার মুখ দিয়ে

বেরিয়ে গেল—বড় কষ্ট আপনাদের।

তিনি তখুনি বললেন—না, এর চেয়েও কষ্ট তাদের, যারা নতুন আসে। বাসা পেতে আগে লাগত সাত-আট বছর—এখন লাগে তেরো-চোদ্দ বছর।

—কোথায় থেকে চাকরি করবে সে বেচারি?

—গাছতলায়। তা কোম্পানি কি জানে! চাকরি করতে হয় কর বাসার খবর কোম্পানি রাখে না। অথচ এই খড়গপুর শহরে কোনো বাসা ভাড়া পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে বাইরের কোনো লোকের ঘর নেই, সবই রেলের কোয়ার্টার।

—সত্যি এ ব্যাপার?

—খুব সত্যি ।

—তারা থাকে কোথায়?

—ওই হয়তো আপনার একখানা বাইরের ঘর আছে, সেখানে একটু জায়গা দিলেন। নয়তো কোনো অবিবাহিত কোয়ার্টারে রইল। অবিবাহিত লোকের কোয়ার্টারে খুব ভিড় হয়। নতুন চাকরে অবিবাহিত যুবকেরা হার্ড টুগেদার—ভেড়ার গোয়ালেরও অধম। নিয়ে যাব আপনাকে তেমনি এক বাসায়।

আর একজন কে বললেন—আর একবার আপনাকে নিয়ে যাব এক নম্বর দু নম্বরে। দেখবেন সে কি জিনিস! মানুষের বাস করবার জন্যে সেগুলো তৈরি হয়নি—কোন্ এঞ্জিনিয়ার সেগুলো তৈরি করেছিল, তার কি নিজের বাড়িতে স্ত্রীপুত্র ছিল না?

এসব কথার উত্তর ভগবানই দিতে পারেন।

সেই আর-একজন ভদ্রলোক বললেন—আপনাকে নিয়ে যেতে হবে আর এক জায়গায়। শহরের দক্ষিণে। সেখানে যতসব অফিসারদের কোয়ার্টারস। দেখে অবাক হয়ে যাবেন—স্বর্গ!

গৃহস্বামী বললেন—হ্যাঁ হে মিত্তির, সেখানেও একবার নিয়ে যেয়ো তো এঁকে।

পূর্বের ভদ্রলোকটি বললেন—না নিয়ে গেলে কনট্রাস্টটা তৈরি হবে না যে। উনি বুঝবেন কি করে যে আমরা কোন্ নরকে, আর তারা কোন স্বর্গে! বোধ হয় মি. বাসুর ওখানে আপনার নিমন্ত্রণ আছে। যেতেই হবে। খবর দেবে এখুনি।

—স্বর্গই বটে। শহরের দক্ষিণে। খোলা জায়গায়। গিয়ে দেখবেন কি চমৎকার হাওয়া। কি সবুজ লন। অর্নামেন্টাল ব্রিজ, বড় বড় কাচের শার্সি-খড়খড়িওয়ালা জানালা-দরজা, লাইট, ফ্যান—সেসব অন্য ব্যাপার। আসল কথা সেসব তো আপনার আমার জন্যে তৈরি নয়, সে ছিল সাহেবদের জন্যে। সাদা চামড়া গায়ে থাকলেই অফিসার্স কোয়াটার্সে তার জায়গা—কি বড় কি ছোট, কোন্ সাহেব কখনো তিন নম্বর চার নম্বরে থাকতো না—দু নম্বর এক নম্বর তো দূরের কথা! কি করে শোষণ করেছে দেশটা। আমাদের মানুষ বলেই গ্রাহ্য করেনি!

বেলা গেল।

পয়লা বৈশাখের উৎসবসভা এবং সেই সঙ্গে—বিচিত্রানুষ্ঠান বলে একটা কথা সব জায়গায় বড্ড চলেছে—সেই 'বিচিত্রানুষ্ঠান।

যথারীতি সবই ছিল। সভাপতি নির্বাচন, উদ্বোধন-সঙ্গীত, মাঝে মাঝে বিকল হওয়া মাইক, রবীন্দ্র সংগীত (ভুল সুরে), আধুনিক কাব্য সঙ্গীত (কোনোপ্রকার সুর নেই তাতে), বক্তৃতা—তার পরে আবার 'বিচিত্রানুষ্ঠান'।

সর্বশেষে সভাপতির অভিভাষণ দিতে যখন উঠলাম, তখন রাত দশটা। লোক জড়ো হয়েছে বহু, কয়েক হাজার হবে। বিচিত্রানুষ্ঠানের পরে কেউ দাঁড়াত না সভাপতির অভিভাষণ শোনবার জন্যে—কিন্তু সভার উদ্যোক্তরা ভারি চালাক, তাঁরা সবশেষে রেখেছিলেন একটি অতি লোভনীয় ব্যাপার এবং সেটা বড় বড় অক্ষরে কার্যসূচীতে ছাপিয়েও দিয়েছিলেন; সেটি হল 'জলযোগ'। অর্থাৎ দালদায় ভাজা বোঁদে, দরবেশ মিঠাই, ব্যশ। শালপাতার ঠোঙায় ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছাসেবকদল সকলের পেছনের সারির ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলুতে শুরু করে দিয়েছে।

দু-একজন চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—বড্ড গোলমাল হচ্ছে, দেওয়া বন্ধ কর এখন—দেওয়া বন্ধ কর—

আর দেওয়া বন্ধ কর! ঐজন্যেই আসা। আর ঐ 'বিচিত্রানুষ্ঠান'-এর জন্যে—

কে এসেছে সভাপতির বাজে ভ্যাজ-ভ্যাজ শুনতে—

দু-একবার হাততালি পড়ল। কিন্তু পিছনের ছেলেমেয়ের সারি 'জলযোগ'-এর ঠোঙার জন্যে অধীর হয়ে উঠেছে। সংক্ষেপে সেরে বসে পড়লাম।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়াও শেষ হয়ে গেল।

একজন ভদ্রলোক এসে বললেন—চলুন, একটু জলযোগ—হেঁ হেঁ—এই পথে—আজ্ঞে—

না। আয়োজন বেশ ভালোই। নিন্দে করবার কিছুই নেই—খুব ভালো আয়োজন।

বেরিয়ে আসছি, এমন সময় ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ কে একটি ছোকরা এসে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। মুখ তুলতেই দেখলাম সে আমাদের গ্রামের হীরু জেলের ছেলে কানাই। কানাই ম্যাট্রিক পাশ করে আগে পূর্ববঙ্গে কোথায় যেন রেলে চাকরি করত।

বললাম—এখানে কাজ কর নাকি?

—হ্যাঁ। পাকিস্তান থেকে চলে এসেছি, ঈশ্বরদি ছিলাম। আপনাকে মা ডাকছে—ওইখানে দাঁড়িয়ে—

—তোমার মা? এখানে?

খুব অবাক হয়ে গেলাম। কানাই জেলের মা চিরদিন পাড়ায় চিঁড়ে কুটে, ধান সিদ্ধ করে ও মাছ বিক্রি করে সংসার চালিয়ে এসেছে। অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে ও বৌ সে। চিরদিন দেখে এসেছি জ্যৈষ্ঠ মাসে আম কুড়ুবার জন্য খুব ভোরে উঠে সে গ্রামের পেছনের বড় জঙ্গলে-ভর্তি আম-কাঁঠালবাগানে যেত, আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোজ তাকে দেখা যাবেই আমবাগানে গভীর কাঁটাবন ও লতাপাতার জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে বাদুড়ে-খেকো আম কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষেই পল্লীগ্রামের দেশী আম শেষ হয়ে যায়, আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ওকে আম কুড়ুতে দেখে আমার হাসি পেত।

আমার বাড়ির ওপর দিয়েই ওর আম কুড়িয়ে ফেরবার রাস্তা। পাড়াগাঁয়ে যেমন হয়, এক বাড়ির উঠোন দিয়ে অপর বাড়ির লোকে যাতায়াত করে। ও যখন ফিরত, তখন ওকে বলতাম, ও কানাইয়ের মা, কি আম কুড়ুলে?

কানাইয়ে মা চুপড়ি দেখিয়ে বলত—আম আর কই দাদাঠাকুর! এই দেখুন প্রায়ই খেয়ো বাদুড়ে-খেকো আম দু-একটা ছাড়া দেখতাম না। ও আবার এত ভালো, যেদিন একটাও ভালো আম পাবে, সেদিন আমাকে বলত—এই আমটা আপনার জন্যি দিয়ে যাই, রাখুন।

আমি বলতাম—না না, তুমি নিয়ে যাও—

ও শুনবো না, ঠিক দিয়েই যাবে।

গ্রামের মধ্যে সকলেই বলত, কানাই জেলের মা বড় সৎ। কখনো কারো সঙ্গে ঝগড়া করেনি। মাছ বিক্রির সময় ওর সরলতার সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণপাড়ার ঘুঘু গিন্নিরা ধারে মাছ নিত, ছ মাস ঘুরিয়েও পয়সা দিত না—অবশেষে হয়তো পয়সা মেরে দিত। কখনো কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ ওর ছিল না। আবার ধার চাইলে, ছ মাস ঘুরিয়ে যে কাল পয়সা দিয়েছে, তাকেও আজ আবার মাছ দেবে।

আমাদের পাড়ার রাম চাটুজ্যের ছেলে জেলি পিতৃহীন দরিদ্র অবস্থায় কোনো রকমে নিজের চেষ্টায় ম্যাট্রিক পাশ করে রেলে কি একটা চাকরি পেয়েছিল। জেলির মা একা থাকতেন বাড়িতে, বাড়ির সামনের ডোবায় হয়তো সকালে কানাইয়ের মা বাসন মাজতে এসে দেখলে বামুনপাড়ার ঘাটে (একটা ছোট্ট ডোবার আবার তিনটে ঘাট!) জেলির মা বড়ি দেওয়ার ডাল ধুতে নেমেছেন। জেলির মা হেসে বললেন—ও জেলে-বৌ, জেলি কাল রাত্তিরে বাড়ি এসেছে—

—ওমা, কি হবে! তাই নাকি?

অমনি সে এঁটো বাসন ফেলে ছুটে আসবে।

—কই, কোথায় গেল আমার সোনা, আমার মানিক, আমার বাছা—

জেলিকে সে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিল। যখন জেলি বাড়ি আসবে, তখন সে কি অকৃত্রিম মাতৃস্নেহের পরিচয় ওর চোখমুখে! জেলির জন্যে বড় কইমাছ জোগাড় করে নিয়ে আসবে, নিজের ঘরের গাইয়ের দুধ ঘটি মেপে দিয়ে যাবে, সরু চিঁড়ে কুটে সঙ্গে বেঁধে দেবে জেলির চাকুরিস্থানে চলে যাওয়ার দিন।

কত দিন এই মাতৃস্নেহের লীলা দেখে এসেছি।

সেই জেলেবৌ আজ এখানে!

কত দূরে যশোর জেলার এক অজ পাড়াগাঁ থেকে জীবনে কখনো যে রাণাঘাটও যায়নি, সে আজ এসেছে খড়গপুরে, সাত সমুদ্দু তেরো নদী পার হয়ে, বাঁশবাগানের তলায়ওদের জেলেপাড়ার সেই খড়ের ঘরখানা ছেড়ে ছেলের বাসায়।

জেলেবৌ আমায় দেখে এগিয়ে এসে বললে— দাদাঠাকুর আমাদের কতদূরে এসে নেকচার বলছে! আমায় কানাই বললে—দাদাঠাকুরের নেকচার হবে আজ সভায়। আমি বলি, আমায় নিয়ে চলো, কতকাল দেখিনি তাঁকে! কি সুন্দর নেকচার বললেন আপনি।

বলে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। বয়সে সে আমার চেয়ে বড়, আমার দিদির সমান। কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ, জেলেবৌ আরো বড় হলেও সে এমনিভাবেই আমায় প্রণাম করত। গ্রামের নিয়ম।

বললাম—ভালো আছ কানাইয়ের মা?

—আপনাদের আশীর্বাদে আছি একরকম। বৌদিদি কই? ছেলেমেয়েরা সব ভালো?

—একরকম ভালো আছে। আজকাল সবাই কলকাতায়।

—দেশে যাননি?

—মধ্যে গিয়েছিলাম একবার, মাস-দুই আগে।

ও অমনি আকুল ও পিপাসিত সুরে বললে—বলুন গাঁয়ে কে কেমন আছে?

ইতিমধ্যে সভার উদ্যোক্তাগণ আমাকে তাগিদ দিতে লাগলেন—তাহলে কাইন্ডলি আসুন, আবার আমাদের নববর্ষের ডিনার পার্টির আয়োজন রয়েছে মি. বাসুর ওখানে—

আমার কিন্তু যাবার ইচ্ছে নেই সত্যি একটুও। এদের টান আমার হাজার ডিনার পার্টির চেয়েও বেশি। সমস্ত খড়গপুর শহরের হাজার সুশিক্ষিত, সুমার্জিত, সুভদ্র লোকের মধ্যে এই গ্রাম্য, অশিক্ষিতা জেলেবৌকে আমার অনেক বেশি আপনারজন বলে মনে হল সেই মুহূর্তে।

জেলে-বৌ বললে—তা হবে না, সে কি দাদাঠাকুর! মোদের বাসায় যেতি হবে না বুঝি, না এমনি ছাড়ব? পায়ের ধুলো দেবেন না বুঝি বাসায়?

—চল, যাব না কেন? বাঃ—

এদিকে এরা ছাড়ে না।—সে কি সার? এখন গেলে আর কি ওরা না খাইয়ে ছাড়বে? যাবেন না—

আমি বললাম, কিছু না, বেশি দেরি হবে না—এখুনি আসছি। দেশের লোক, ধরেছে—

ওদের সঙ্গে ওদের বাসায় গেলাম। মুশকিল, দু নম্বরের বাসা, কম মাইনের লোকের বাসা!

আমাকে ওরা নিয়ে গিয়ে ঘরে বসালে। দুখানা ছোট্ট ঘর, একটা রান্নাঘর, একটা বারান্দা—এই হল দু-নম্বর কোয়াটার্স। বৈশাখ মাসের দারুণ উত্তাপে সে ঘরের অবস্থা যে কি, তা না অনুভব করলে বুঝিয়ে বলা কঠিন। জেলখানা এর চেয়ে ভালো। নড়বার-চড়বার জায়গা নেই। আলো বাতাস আসে না, হাঁপ ধরে যায়। একখানা ঘর একটু সাজিয়ে রেখেছে, একখানা ফর্সা চাদরও পেতে রেখেছে। বিছানায়। একটা সস্তা টাইমপিস ঘড়ি

কিনে ছোট একটা টেবিলে রেখে দিয়েছে। ওর বাপ হীরু জেলেকে আমরা বাল্যকালে দেখেছি বাঁশের দোয়াড়ি তৈরি করে মাছ ধরত, হাটে মাছের ঝুড়ি নিয়ে গিয়ে মাছ বিক্রি করত। কানাইয়ের মা টিনের ক্যানেস্ত্রায় ধান সেদ্ধ করত বাড়ির উঠোনের আমতলায়। বড় গরিব ছিল ওরা।

কানাইয়ের বৌ এসে আমাকে প্রণাম করলে। বললে—বসুন, একটু চা করে দেব?

আশ্চর্য, এরা চা খেতে আরম্ভ করেছে এখানে এসে! কানাইয়ের মা আহ্লাদের সুরে বললে—কানাই একটা ঘড়ি কিনেছে, দেখেছ দাদাঠাকুর?

সেই সস্তা টাইমপিস ঘড়িটা।

আমি সেটা হাতে নিয়ে ভালো করে নাড়িচাড়ি, দেখি। খুব প্রশংসা করি ঘড়ির।

বললাম—বাঃ, বেশ টেবিল-চেয়ার দেখছি যে!

—কানাই সব করেছে দাদাঠাকুর।

দিব্যি সাজানো ঘর। ওখানা কি টাঙানো?

—বৌমার হাতে তৈরি, ঝিনুক দিয়ে তৈরি ফুল।

—বাঃ, বেশ করেছে বৌমা।

—হবে না, বেশ ভালোঘরের মেয়ে যে। গান গাইতে জানে—দিব্যি গান, হ্যাঁ।

—গান?

—হ্যাঁ, বাজনার বাক্স বাজিয়ে—

হারমোনিয়াম? এটা সত্যি আশ্চর্য কথা হল!

—শোনবা গান দাদাঠাকুর? ও বৌমা, চা করে গান শুনিয়ে দাও দাদাঠাকুরকে। আজ আমার কত আনন্দের দিন! দাদাঠাকুর পায়ের মাটি ঝেড়েছেন আমার ঘরে!

—না, বড্ড খুশি হলাম কানাইয়ের মা। কানাই যে এত উন্নতি করবে সব রকমে, তা আমি জানতাম না।

কানাইয়ের মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললে—আশীর্বাদ কর দাদাঠাকুর, কানাই আমার বেঁচে থাকুক, সংসারে দুবেলা দুমুঠো খেয়ে আঁচায় যেন। জান তো, যখন তিনি মারা গেল, কি কষ্ট করে মানুষ করেছি! কানাই তখন এক বছরের, বাচ্চা—কত কষ্ট করিছি ওর জন্যি। লোকের ধান সেদ্ধ করে, চিঁড়ে কুটে, বাসন মেজে তবে ওকে মানুষ করিছি। সেই কানাই আজ বিয়ে করে মোরে বাসায় এনেছে, ঘড়ি কিনেছে, কেদারা কিনেছে, চা খাচ্ছে—

আমি গম্ভীরভাবে বললাম-ঠিক ঠিক, তার আর কথা কি বল!

এই সময় কানাই আমার জন্যে খাবার কিনে নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। কানাইয়ের বৌ একটা রেকারিতে গরম কুমড়োর ফুলুরি রসগোল্লা ও নিমকি আমায় খেতে দিলে। বললে— খেয়ে দেখুন, কুমড়োর ফুলুরি এখন ভাজলাম। চা নিয়ে এসে কানাইয়ের মা বললে—এই পেয়ালাগুলো কানাই এবার কিনেছে। ভালো দাদাঠাকুর?

—খুব ভালো। চমৎকার।

কানাই সলজ্জ সুরে মাকে বললে—তুমি যাও ওদিকে, পান নিয়ে এসো কাকাবাবুর জন্যে।

সে বেচারি জানে না, তার মা আগে কি বলেছে বা এখন আরো কি বলবে!

কানাইয়ের মা কিন্তু নাছোড়বান্দা।

ওর বৌমাকে নিয়ে এসে হাজির করলে গান শোনাতে। হারমোনিয়াম নিয়ে এল।

বললাম—এ হারমোনিয়াম কি কানাই কিনেছে নাকি?

কানাইয়ের মা বললে—না দাদাঠাকুর। বৌমা গান করে বলে পাশের বাসা থেকে আনা। গান গাইলে কানাইয়ের বৌ। মন্দ নয়, বেশ গান।

আসবার সময় কানাইয়ের মা বললে—কেমন গান গায় আমার বৌমা ?

—ভারি চমৎকার। অতি সুন্দর গান।

কানাই বললে—তুমি যাও দিকি মা-ও দিকে যাও, কাকাবাবুর দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমি পৌঁছে দিয়ে আসি।

ওদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

কানাইয়ের মা আমার সঙ্গে গলির মোড় পর্যন্ত এল।

সে বড্ড খুশি যে, আমি তাদের বাসায় এসেছি বা এখানে চা-খাবার খেয়েছি।

আমাদের গ্রামে বসে কখনো এ ব্যাপার সম্ভব হত না।

আরো খুশি এই যে, কানাই আজ এত বড় হয়েছে, এত উন্নতি করেছে।

বার বার আমায় বলতে লাগল—যদি গাঁয়ে যান দাদাঠাকুর, মোদের কথা বলবেন সবাইকে। আমি কতকাল গাঁয়ে যাইনি। সেই আর বছর আষাঢ় মাসে বাসায় এইছি, এক বছর হতি চলল—বড় মনে পড়ে গাঁয়ের কথা—মোদের উঠোনের গাছটার অতগুলো পেয়ারা, এবারে কে খাবে কি জানি!

এর পরে মি. বাসুর ডিনার পার্টিতে খুব জাঁকজমকের ভোজ ও আদর-আপ্যায়নের ব্যাপার। চপ, কাটলেট, পায়েস, ক্ষীর, আম, সন্দেশের ছড়াছড়ি। সত্যি চমৎকার খাওয়া। অফিসারদের অঞ্চলে বড় বাংলো। টেনিসের সবুজ লন। ভারবিনা ও জিনিয়ার সারি। অ্যারিস্টলোকিয়া লতার ঝুমকো ফুল গেটে দুলছে। মি. বাসুর মেয়ে কল্যাণী, নীলিমা এসরাজ বাজিয়ে আমাদের শোনালে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলে, ছোট মেয়ে রেণু একটা ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করলে। তারপর দুই বোনে মিলে রামধনু গাইলে অতি সুন্দর। দুই বোনই শান্তিনিকেতনে থেকে পড়াশোনা করে। দেখতেও সুন্দরী।

খেতে বসে কতবার মনে হল, কানাইয়ের মার বাসার সেই সস্তা টাইমপিস ঘড়িটাতে কটা বাজল দেখে আসি।